



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 693 - 700

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

বৈষ্ণব পদাবলী ও রবীন্দ্র কবিতায় শৈশব ভাবনা

অনুতর্ষ মুখোপাধ্যায়

অতিথি অধ্যাপক, মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: anutorshomukherjee@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Childhood
images, Role play,
Adolescence,
Psychology,
Parenting,
Observation,
moral and values,
Imaginative mind.

Abstract

In this article we are trying to discuss about the childhood images in the 'Vaishnav padabali' and poems of Rabindranath Tagore. We somehow find that, Rabindranath in his poems were deeply influenced by the padabali specially when it comes to childhood images. Though these two genres of literature were emerged in different time. In various padabalis we find the images of krishna as 'gopal'. Medieval literature is all about the divine entity and extolling the glories of omnipresent. In between we find the rhythm of flesh and blood silently. The childhood images in padabali are monocentric. 'gopal' is the only child there. Rabindranath in his poems described the images of childhood in bigger spectrum. These two images of childhood need a proper attention to understand the evaluation of child and childhood images.

Discussion

সাহিত্যে শিশু বা শৈশব এবং শিশু-কিশোর সাহিত্য এক বিষয় নয়। আবার শিশুদের জন্য লেখা সাহিত্য শুধুই শিশুপাঠ্য এমনটা ভাবার কোন কারণ নেই। শিশুদের জন্য সাহিত্য রচনার প্রবণতা গড়ে উঠেছিল উনিশ শতকে। তবে এ সম্পর্কে সচেতনতা প্রথম তৈরি হয়, সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নিও-ক্লাসিক্যাল যুগের চিন্তাবিদদের মনে। ইংরেজ দার্শনিক John Locke তাঁর 'An Essay Concerning Human Understanding' (১৬৯০)- এ বলেছেন শিশুদের মন থাকে সাদা পাতার মতো। তাদের ভালোর জন্য সেই পাতায় ঠিক ধারণাগুলি লিখে দিতে হবে।

এ কথা ঠিক যে, প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুদের জন্য মৌলিক কিছু লেখা হয়নি। আসলে শিশু-কিশোরদের মনোরঞ্জনের জন্য স্বতন্ত্র কোন চিন্তা ভাবনা তখন ছিল না। উনিশ শতকে মানবতাবাদের উন্মেষের যুগে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হল। ফলে সেই ব্যক্তির তালিকা থেকে শিশু-কিশোররাও বাদ পড়ল না। সুশীল রায় শিশু-বিকাশের বয়সকালের ধারণা দিয়ে - ১) Early infancy, ২) Late infancy, ৩) Early childhood, ৪) Late childhood, ৫) Adolescence ৬) Adulthood- এই স্তরগুলির কথা বলেছেন।

বাংলায় প্রমদাচরণ সেন (১৮৫৯- ১৮৯০) সম্পাদিত বালক বালিকাদের জন্য পাঠ্য সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'সখা' বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম আদর্শ শিশু-কিশোর পত্রিকা। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রস্তাবনায় প্রমদাচরণ লেখেন “আমাদের হতভাগ্য দেশে বালক বালিকাদের জ্ঞানের ও চরিত্রের উন্নতির জন্য অধিক লোক চিন্তা করেন না, অথবা

করিবার অবকাশ হয় না। এই জন্যই সখার জন্ম হইল।” ১৩০১-এর বৈশাখ মাস থেকে ‘সখা’ এবং ‘সাখী’ দুটি পত্রিকা যুগ্ম রূপে প্রকাশিত হতে থাকে ভুবনমোহন রায়ের সম্পাদনায়। ইনি পাশ্চাত্য শিশু-কিশোর সাহিত্য সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। ফলে এই পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলির বিষয় পরিকল্পনায় শিশুকে মুখ্য চরিত্র হিসেবে নিয়ে আসার প্রয়াস লক্ষ করা গেল। প্রসঙ্গত বলতে হয়, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কাহিনির দাবিতেই শিশু চরিত্র এসেছে। যদিও তা চরিত্র হিসেবে সেভাবে প্রস্তুতি হয়নি এবং তাদের শৈশব সংক্ষিপ্ত পরিসরে সরলরৈখ্য অঙ্কিত। তথাপি পারিবারিক বৃত্ত শিশুকে বাদ দিয়ে যে সম্পূর্ণ হয় না, সে সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা এই লেখাগুলি থেকে পাওয়া যায়। আরেকটি কথাও মনে রাখতে হবে, শিশু-কিশোরের ভেদরেখাটিও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বহুক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট নয়। তাদের মনের চাহিদা, পারিবারিক সম্পর্ক, জীবন সম্পর্কে ধারণা কিম্বা যাপিত জীবনের কোন চিত্র এখানে অঙ্কিত হওয়ার কোন অবকাশ ছিল না। এর কারণ অবশ্য অস্পষ্ট নয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য মানেই দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তনমূলক কাহিনি। কাজেই যেখানে কাহিনি এবং দেবদেবীর পূজা তথা মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা মূল লক্ষ্য, সেখানে চরিত্র-চিত্রণ অভিপ্রেত থাকে না। তথাপি সে-যুগের সাহিত্যে অনেক ক্ষেত্রেই চরিত্র হিসেবে শিশুর উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে, বিশেষত তাদের শৈশব কোন কোন রচনায় বিশেষত্ব নিয়ে এসেছে। যেমন বৈষ্ণব পদাবলীতে কৃষ্ণের বাল্যলীলার পদগুলি এক অপূর্ব শৈশবের দ্যোতক। হতে পারে তা খন্ড চিত্র, কিন্তু চিরশিশুর অখন্ডতায় তার রূপ প্রসারিত। যে কারণে রবীন্দ্রসাহিত্যে, মূলত কাব্যে শিশু ও শৈশবের উত্তরাধিকার অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে। বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রবেশের আগে সংক্ষেপে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ ও ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ কাব্যে শিশু তথা শৈশবের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের ‘জন্ম খন্ডে’ ‘বিজয় নাম বেলাতে ভাদর মাসে’ শীর্ষক পদটিতে কৃষ্ণের জন্মের যে বর্ণনা কবি বড়ু চণ্ডীদাস দিয়েছেন, তা অবশ্যই ভাগবত অনুসারী। তবে ভাগবতে যা বিস্তারিত, এখানে তা স্বাভাবিক কারণেই সংক্ষিপ্ত। প্রবল ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ভাদ্র মাসের রোহিণী অষ্টমী তিথিতে কংসের কারাগারে কৃষ্ণের আবির্ভাব ভাগবতে এভাবে বর্ণিত - ‘মঘোনি বর্ষতসকৃদ্ যমানুজা/ গম্ভীরতয়োঘজবোর্মিফেনিলা। ভয়ানকাবর্তশতাকুলা নদী/ মার্গং দদৌ সিন্ধুরিব শ্রিয়ঃ পতেঃ।’ বড়ু চণ্ডীদাস যেভাবে সদ্যোজাত কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করেছেন

“হেন শুভক্ষণে দেব জগন্নাথ হরী।/ শঙ্খ চক্র গদা আর শারঙ্গ ধরী।।”^২

সেই ভাবেই ভাগবতে বলা হয়েছে - ‘তমদ্ভুতং বালকমধুজেন্মণং/ চতুর্ভুজং শঙ্খগদার্যুদায়ুধম্।/ শ্রীবৎসলক্ষ্মণং গলশোভিকৌন্তভং/ পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্।।’ এই অদ্ভুত বালককে দেখে বসুদেব বিস্মিত হয়েছিলেন। কৃষ্ণের রূপের বর্ণনায় বড়ু চণ্ডীদাস লিখেছেন -

“নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ।/ তাত ময়ূর পুচ্ছ দিল সুবেশ।। ...নানা মণি অলংকার শোভিত শরীরে।/ পীত বসন লোভে বাঁশি ধরে করে।।”^৩

ভাগবতে বসুদেব দৃষ্ট সেই বালকের নেত্র পদ্মপলাশের মতো রক্তাভ এবং তাঁর চতুর্ভুজে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম, কণ্ঠে উজ্জ্বল কৌন্তভমণি, ঘন মেঘসদৃশ শ্যামসুন্দর দেহে পীতাম্বরের শোভা, কুটিল কুন্তলরাজি, কটিদেশে কাঞ্চি, বাহুসমূহে অলংকারের দ্যুতি। সেই বালকের সর্বাঙ্গ থেকে অপূর্ব জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। বড়ু চণ্ডীদাস কৃষ্ণের আবির্ভাব ও রূপগুণের বর্ণনায় যতদূর সম্ভব মূল ভাগবতকে অনুসরণ করেছেন। তবে তাঁর কাব্যে শিশু কৃষ্ণ বা তার শৈশব খুব সীমায়িত পরিসরে বিবৃত। অন্যদিকে পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি মালাধর বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ কাব্যে তা অনেকটাই বিস্তৃত। মালাধর পৃথকভাবে শিশু কৃষ্ণের পুতনা বধ, তৃণাবর্ত বধ, বকাসুর বধ, বৎসাসুর বধ, অঘাসুর বধ ইত্যাদি বিজয় বা কীর্তিকথা বর্ণনা করেছেন। কালীয় দমনকালে কৃষ্ণের বয়সের উল্লেখ মালাধর বসু জানিয়েছেন তাঁর বয়স সাত বৎসর। কবি একাধিকবার কৃষ্ণকে শিশু বলে উল্লেখ করেছেন -

“হেনক সুন্দর শিশু কথাও না দেখ।”^৪

আবার বৎসাসুর বধে উল্লেখ করছেন - ‘একদিন রাম কৃষ্ণ গোআল সিধু লঞা।’ (‘বৎসাসুর বধ’, পৃ. ১৮৮) ইত্যাদি। মধ্যযুগের সবচেয়ে বড় সম্পদ বৈষ্ণব পদাবলী। প্রাকচৈতন্য, চৈতন্য সমসাময়িক এবং চৈতন্যোত্তর যুগের বিস্তৃত পরিসর জুড়ে এর ব্যাপ্তি। তবে বৈষ্ণব পদাবলীতে শিশু চরিত্র হিসাবে কৃষ্ণের ভূমিকা প্রাকচৈতন্যযুগে বাৎসল্য রসের প্রেক্ষিতে

লক্ষণীয় নয়। ভগবানকে পুত্র রূপে পাওয়ার সাধনা চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের বিষয়। বৈষ্ণবের পঞ্চরসের সাধনায় কৃষ্ণকে নিয়ে এই বাৎসল্যের প্রবাহ। বৈষ্ণব পদাবলীতে বাল্যলীলা ও গোষ্ঠলীলার পদে পুত্ররূপে ও সখারূপে কৃষ্ণ বন্দিত হয়েছেন। সচ্চিদানন্দ, রাধাবল্লভ ও গোপীবল্লভ রূপে কৃষ্ণের যে পরিচয় বৈষ্ণব পদাবলীর তত্ত্ব-দর্শনকে পুষ্টি দান করেছে, শিশু গোপালের এই রূপ তার থেকে পৃথক। বৈষ্ণবীয় পঞ্চরসে বাৎসল্যের কথা থাকলেও পদকর্তারা তত্ত্বনিরপেক্ষ ভাবে পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানের স্নেহ-প্রীতিমধুর সম্পর্ক চিত্রিত করেছেন। কারণ, পাল্যপালকের এই সম্পর্ক শুধু ভক্ত ভগবানের রূপকে আবৃত করা যায় না; তা চিরন্তন, চিরমধুর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যে আমাদের হৃদয়পুরের নিত্যকালের আকাজক্ষার ধন শিশুকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন, তাতে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব-নির্যাস লক্ষ্য করি। 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের 'খেলা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

“কিসের সুখে সুহাসমুখে/ নাচছি বাছনি,/ দুয়ার পাশে জননী হাসে/ হেরিয়া নাচনি।”^৫

উদ্ধৃতাংশটি যশোদা-নন্দন গোপালের নৃত্যরত শিশুরূপের আভাস লক্ষ্য করা যায়। পদাবলীর যে গোপাল চরিত্র আমরা পাই তাতে দুরন্তপনার ছাপ স্পষ্ট। সখাদের কাঁধে চড়ে বেড়াতে তার ভালো লাগে। আর ভালো লাগে পরের ঘরের দই নদী চুরি করে খেতে। গোপনারীরা যশোদার কাছে নালিশ করলে জননী কানাইকে শাস্তি দেওয়ার জন্য বেঁধে রাখেন। এতে গোপাল অভিমানী হয়। পিতা নন্দের কাছে গিয়ে বলে, মায়ের কারণেই তাকে গোকুল ত্যাগ করে চলে যেতে হবে–

“না থাকিব তোমার ঘরে/ অপযশ দেহ মোরে/ মা হইয়া বলে নদীচোরা।।”^৬

ছোটরা মাঝে মাঝে বড়োদের ভূমিকা পালন করতে চায়। শিশুর ভিতরে নিরন্তর এই বড় হয়ে ওঠার চেষ্টা চলতে থাকে। তাই গোপাল জননী কে বলেছে, –

“ওগো মা, আজি আমি চরাবো বাছুর।”^৭

মা প্রথমে অনুমতি না দিলেও পুত্রের আবদার তাঁকে শেষ পর্যন্ত মেনে নিতেই হয়। তাছাড়া এটাই তাঁদের বৃত্তি। তথাপি মায়ের মন প্রবোধ মানে না। কারণ, তাঁর মনে হয়, ‘মাঠে বড় রিপু ভয় আছে।’^৮ তাই শিশুর নিরাপত্তার কথা ভেবে কৃষ্ণসখা শ্রীদাম সুদামকে ডেকে তিনি অনুরোধ করেন গোপালকে যত্ন করে গোষ্ঠে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যেন নব তৃণ কুশাক্ষুরে গোপালের চরণ বিদ্ধ না হয়। বনপথে শিশু কৃষ্ণকে নিয়ে তারা যেন বেশি দূরে না যায়। গোবৎস যেন নিকটে রাখে, আর মাঝে মাঝে বংশীধ্বনিতে বা শিশু বাজিয়ে যেন জননীকে তারা তাদের উপস্থিতি জানায়। গোচারণে যাওয়ার আগে যশোদা পুত্রকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কানাইকে বিপদমুক্ত রাখার জন্য মন্ত্র পড়ে তার চূড়া বেঁধে দিতে ভোলেননি। পুত্রের জন্য তাঁর স্নেহ ভালবাসা যেমন অফুরান, তেমনি উদ্বেগ উৎকণ্ঠাও কম নয়। বৈষ্ণব পদাবলীতে বাৎসল্য এবং সখ্যের চিত্রণে বাস্তবতা ও চিরন্তনতা আছে। রবীন্দ্র সাহিত্যের বিপুল পরিসরে শিশু-কিশোরের উপযোগী সাহিত্যের সংখ্যা কম নয়। আবার তাঁর অনেক রচনায় শিশু-কিশোররা চরিত্র হয়ে উঠেছে। আপাতভাবে যে কবিতাগুলি ছোটদের জন্য লেখা বলে মনে হয়, সেগুলির আবেদন পরিণতমনস্ক মানুষের উপলব্ধিতেই ধরা পড়ে। রবীন্দ্র সাহিত্যের এই ব্যাপ্তির জন্য আমরা শুধুমাত্র কবিতার প্রতিই মনোযোগ দেব। ‘জীবনস্মৃতি’তে যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখি, তিনি একজন পরিণত মনের বালক। সুতরাং তাঁর রচনায় শিশু চরিত্রের অবতারণা পরিণত বয়স্ক পাঠকের কাছেও গভীর বিশ্লেষণের অবকাশ রাখে। সেখানে অধিকাংশ সময় প্রতিফলিত হয় রবীন্দ্র জীবন দর্শন। তাঁর 'শিশু' 'শিশু ভোলানাথ' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে যে শিশু চরিত্রকে দেখি, তার কোন কোন ক্ষেত্রে বৈষ্ণব পদাবলীর যশোদা নন্দন গোপাল চরিত্রের অনুপ্রেরণা দুর্লক্ষ্য নয়।

অধ্যাপক সুকুমার সেন রবীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন।

“শিশুর কবিতাগুলিকে চারি বর্গে ভাগ করা চলে – বাৎসল্য-তত্ত্বাশ্রিত, বাৎসল্য-রসময়, শিশু-বোধ ও

শিশু কল্পনা। প্রথম দুই বর্গে কবির কথা, শেষ দুই বর্গে শিশুর কথা।”^৯

বৈষ্ণব পদাবলীতে কৃষ্ণের বাল্যলীলা বিষয়ক পদে শিশু কৃষ্ণকে বোঝার জন্য কবির বিবৃতিই প্রাধান্য পেয়েছে। তবে কোন কোন স্থানে শিশু কৃষ্ণ, অর্থাৎ বালগোপালের সংলাপ বা জননী যশোদার সংলাপও গুরুত্ব পেয়েছে। গোপাল ও জননীর একত্রে উপস্থিতি এবং কৃষ্ণের সঙ্গে তার সখাদের উপস্থিতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও ভাব ও বক্তব্য বিষয়কে স্পষ্ট করে তুলেছে। পদগুলিতে প্রতিটি সম্পর্কের সুদৃঢ় বন্ধনের সন্ধান পাওয়া যায়। খুঁজে নেওয়া যায় তাদের পারিবারিক বৃত্তকে।

যদিও কৃষ্ণের পালক পিতা নন্দের ভূমিকা সেখানে ‘passive’। রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে শিশুর পরিবেশ ও প্রকৃতি সম্পর্কিত ধারণা, তার মধ্যে গড়ে ওঠা দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ, নিছক ছেলেমানুষি, কিছুটা যুক্তিহীন অগোছালো ভাবনা বা সুদূরের কল্পনা ইত্যাদিরও প্রকাশ দেখি। এর সঙ্গে হয়তো শিশু রবীন্দ্রনাথেরও সাদৃশ্য আছে। তাঁর শৈশব-অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে এইসব রচনায়। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন নিজের মনোজগতে এক বিশ্বশিশুকে লালন করেছেন, যে আবহমান কাল ধরে অপরিবর্তনীয়। রবীন্দ্রনাথ পূর্ববর্তী বা তাঁর সমকালে শিশু সাহিত্যের একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল বিদেশী সাহিত্যের তর্জমা, কিম্বা তার ভাবানুবাদ। তবে নীতিকথা, রূপকথা, লোককথা, ঈশপ ও পঞ্চতন্ত্রের গল্প, বিদেশি রূপকথার অনুবাদ, রবিনসন ক্রুশো, অলিভার টুইস্ট ইত্যাদি উপভোগ্য পাঠ্যও ছিল। আমরা যদি সেই সময়কার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব, দেশব্যাপী ব্যাপক স্বদেশ চेतনাই শিশু সাহিত্যের সম্পদ সংগ্রহ ও সৃষ্টিশীলতার অন্যতম কারণ। একইভাবে চলতে থাকে লোকসাহিত্য সংগ্রহের চেষ্টা। শিশুর কাছে নিয়মে বাধা ধরা জীবন যে একেবারেই অপছন্দের, একথা রবীন্দ্র সাহিত্যে নানা প্রসঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে। স্কুলের চলতি লেখাপড়া কবির কোনদিনই ভালো লাগেনি। নিজেকে ‘স্কুল পালানো ছেলে’ বলতে দ্বিধা করেননি তিনি। বিদ্যালয়ের অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতাগুলো তাঁর প্রায় প্রতিদিনের খেলায় প্রতিফলিত হতো। আমরা একে সাইকোলজির ভাষায় ‘role playing’ বলতে পারি। যেমন, স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরে বারান্দার রেলিংগুলোকে ছাত্র বানিয়ে তিনি শাসন করতেন। প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়বে, ‘শিশু’ কাব্যগ্রন্থের ‘মাস্টারবাবু’ কবিতার কানাই মাস্টারকে, যে ছাত্র বিড়ালটিকে শাসন করার জন্য মিছামিছি হাতে কাঠি নিয়ে বসত। সমগ্র কবিতাটিতে কৌতুকের মধ্য দিয়ে ছাত্রের স্বাভাবিক ভূমিকা এবং ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কটি ব্যক্ত হয়েছে। আমাদের জীবনে পিতা-মাতার প্রভাব অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথও এর ব্যতিক্রম নন। পিতার প্রভাবই তাঁর জীবনে ছিল সর্বাধিক। তাছাড়া যে-কোন শিশুই ছোটবেলায় বড়দের মতো আচরণ করতে চায়। বড়দের মতো দায়িত্বশীল হিসেবে প্রমাণ করতে চায় নিজেকে। বৈষ্ণব পদাবলীতে কৃষ্ণের বাল্যলীলার পদে সখাদের সঙ্গে তাঁর গো-চারণে যাওয়ার আগ্রহে বাল্যকৌড়ার ঝোঁকের পাশাপাশি ‘বড়োদের মতো হয়ে উঠতে চাওয়া’র মানসিকতাও হয়ত ছিল। পদকর্তা বিপ্রদাস ঘোষ, যাদবেন্দ্র ও বলরাম দাস এ-সম্পর্কিত কিছু সূত্র দিয়েছেন। বলরাম দাস লিখলেন গোপালের গোরু-বাছুর নিয়ে মাঠে যাওয়ার সাধ শুনে যশোদার আক্ষেপের কথা- ‘বিহি কৈলা গোপ-জাতি গোধন পালন বৃত্তি।’^{১০} অর্থাৎ পারিবারিক পেশা সূত্রেই এ কাজ তাঁর করণীয়। বিপ্রদাস ঘোষের পদে আছে জননীর কাছে গোধন পালনে গোপালের আগ্রহের কথা - ‘ওগো মা, আজি আমি চরাব বাছুর।’^{১১} বৈষ্ণব কবিতা যেখানে গোপালের সখাসহ সম্মিলিত কৌড়ার চিত্র আঁকেছেন সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন একলা বালকের কথা। ছুটির দিনে বাড়িতে ঠাকুরের আমলের পরিত্যক্ত পালকিতে বসে মনকে লাগামছাড়া করে দিতেন রবি। শিশুর স্বপ্নে ওই পালকি হয়ে উঠতো তাঁর নানা যাত্রার বাহন। তাঁদের বাড়িতে একবার ডাকাতের খেলা দেখানো হয়েছিল। মস্ত কালো জোয়ানের দল। তাদের লম্বা ঝাঁকড়া চুল। লম্বা লাঠির উপর ভর করে তারা লাফিয়ে দোতলায় উঠেছিল। এছাড়া ভূতের কাছে ডাকাতের গল্প শোনার অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল। সেই সব মিলিয়ে বীরপুরুষ কবিতার সৃষ্টি -

“তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে/ দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে।/ আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার পরে।/
টগবগিয়ে তোমার পাশে পাশে।/ ...এমন সময় হারে রে রে রে/ ওই যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে.../
তুমি ভয়ে পালকিতে এক কোণে/ ঠাকুর দেবতা স্মরণ করছ মনে।/ আমি যেন তোমায় বলছি ডেকে/
‘আমি আছি ভয় কেন মা করো।’”^{১২}

এই ‘Chivalry’ র বাসনা শিশুর মনে সংগুপ্ত থাকে, যার দ্বারা বড়োদের মুগ্ধ করাতেই তার ভালোলাগা। জীবনস্মৃতি’র সাক্ষ্যে জানা যায়, উপনয়নের পর বাবার সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণ রবীন্দ্রনাথের জীবনে এক বিশেষ অভিজ্ঞতা। বাবার কাছে চিঠি লেখার আগ্রহও তাঁর মধ্যে প্রবল ছিল। মাঘোৎসবের প্রাক্কালে ‘নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছে নয়নে নয়নে’ গানটি লিখে পিতার কাছ থেকে পাঁচশ টাকার চেক উপহার পাওয়া তাঁর জীবনে এক স্মরণীয় ঘটনা। শ্রদ্ধায়, সম্মানে, দূরত্বে, নৈকট্যে দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিলেন একজন আদর্শ মানুষ। এমন মানুষকে দেখেই হয়তো একজন বালকের পক্ষে বলা সম্ভব ‘বড় হয়ে বাবার মত হবো।’ ‘শিশু’ কাব্যের ‘ছোটোবড়ো’ কবিতায় (২৮ শ্রাবণ, ১৩১০) বড়ো হয়ে বাবার মতো হলে কত অসাধ্য যে সাধন করা সম্ভব একটি শিশুর জবানিতে তার বিবরণ আছে। তখন দাদাকে বকা যাবে। গুরু

মশাই পড়তে বসতে বললেও বলা যাবে, 'খোকা তো আর নেই, হয়েছি যে বাবার মত বড়ো।'^{১০} এমনকি বাবাকেও চমকে দিয়ে খোকা বলবে - 'আমি এখন তোমার মত বড়ো।' শিশুর এই আচরণকে Psychology-র ভাষায় 'Family role-play' বলে।

প্রসঙ্গত বৈষ্ণব পদাবলীর কৃষ্ণের বাল্যলীলার পদে বালগোপালের গোচারণ অসচেতনভাবেই নিজেকে বড়ো করে তোলার অভিপ্রায়। যদিও তার খেলার ইচ্ছাটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে গোচারণ ও খেলার মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে তার দায়িত্ব ও শৃঙ্খলাবোধ। বলরাম দাস লিখেছেন -

“যে বনে যে ধেনু ছিল ফিরিয়া একত্র কৈল চলাইলা গোকুলের মুখে।”^{১১}

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যখন ‘ক্ষণিকা’র ‘জন্মান্তর’ কবিতায় ‘সুসভ্যতা:র আলোকের দূরবর্তী ব্রজের রাখাল’ হওয়ার কথা বলেন, তখন অবশ্যই তার ভিন্নমাত্রিক আবেদন তৈরি হয়। রবীন্দ্রনাথের শিশু ভাবনায় বৈষ্ণব পদাবলীর কৃষ্ণ নানাভাবে এসেছে। শিশু কৃষ্ণের মধ্যে তিনি চিরশিশু, বিশ্বশিশুর রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন বলেই তাকে আপন উপলব্ধিতে উপস্থাপন করেছেন। আমরা আগেই বলেছি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শিশু চরিত্রে অতিরঞ্জন ও অলৌকিকতাই বেশি। তাই শিশু চরিত্রগুলিও চরিত্র হিসেবে সফল হয়ে উঠতে পারেনি। যুগ বা সময়ের হিসেবে তা সম্ভবও ছিল না। তবে অপাপবিদ্ধ, অমলিন শিশু-স্বভাবের বৈশিষ্ট্যই সেখানে প্রকাশ পেয়েছে। শৈশবেই তাদের মধ্যে এক পরিণত মানুষের সম্ভাবনা আভাসিত হয়েছে। যদিও ছোট থেকে বড়ো হয়ে ওঠার ধাপগুলি এখানে স্পষ্ট নয়। শিশুরা স্বভাবত নিভীক, সত্যনিষ্ঠ হয়। তাদের মনে অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহল লক্ষ করা যায়। ‘জগৎ পারাবারের তীরে’ এদের খেলাঘর। ঝঞ্ঝা, বিপদকে উপেক্ষা করার সাহসী নির্মেষ মন এদের সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর নিবিড় পাঠে তাঁর কবিতায় অনেক শিশু চরিত্রের আদলে কৃষ্ণকে বেঁধেছেন। ‘শিশু’ কাব্যের ‘খেলা’ কবিতায় (৫ শ্রাবণ, ১৩১০) বৈষ্ণব প্রভাবকে আত্মস্থ করেই কবি লিখেছেন - ‘রাখাল বেশে ধরেছে হেসে/ বেণুর পাঁচনি’। এখানে ‘পাঁচনি’ শব্দটি নসির মামুদের কৃষ্ণের গোষ্ঠীলীলার পদে উল্লিখিত ‘পাঁচনি কাচনি বেত্র বেণু’র^{১২} কথা স্মরণে আনে। রবীন্দ্রনাথ যেন শিশুর মধ্যে বিশ্বরূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় আমাদের ঘরের সন্তান আর ব্রজের রাখালকে এক করে দেখেছেন। ‘ভবনে’র মাঝে নিয়ে এনেছেন ‘ভুবনে’র সম্ভাবনা। ‘বিহান বেলা আঙিনা তলে/ এসেছ তুমি কী খেলাছলে’^{১৩} - পঙ্ক্তিদ্বয়ে শিশুর খেলা ও লীলার জগত যেন একীভূত হয়ে গেছে। ‘শিশু’র ‘খেলা’, ‘খোকা’, ‘ঘুমচোরা’ কবিতাগুলিতে বর্ণনামূল্যেই প্রাধান্য পেয়েছে। ‘অপযশ’ কবিতায় আবার ‘বৈষ্ণব পদাবলী’র উত্তরাধিকার স্পষ্ট। ‘ছেলেমানুষ’ যা করতে পারে, তা সে প্রকৃতির স্বভাবেই করে। কারণ, বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরেও খামখেয়ালিভাব আছে -

“খেলতে গিয়ে কাপড়খানা/ ছিঁড়ে খুঁড়ে এলে/ তাই কি বলে লক্ষ্মীছাড়া ছেলে।/ ছি, ছি, কেমনধারা।/ ছেঁড়া মেঘে প্রভাত হাসে,/ সে কি লক্ষ্মীছাড়া।”^{১৪}

পদকর্তা বলরাম দাসের ‘দাঁড়াইয়া নন্দের আগে’ পদটিতে গোপালকে গোপযুবতীরা ননী চুরির অপবাদ বা অপযশ দেওয়ার জন্য যশোদা তাকে শুধু ভৎসনা করেই ক্ষান্ত হননি, বেঁধেও রেখেছিলেন। আসলে এ সত্যিকারের শাসন নয়, অভিমানের শাসন। যারা গোপালের নিন্দে করে তাদের প্রতি ক্ষোভ, অভিমান। স্বভাব চাঞ্চল্য শিশুর বৈশিষ্ট্য। তাই বলে কি অভিযোগের তুফান তুলতে হবে? ‘অপযশ’ কবিতার শেষ স্তবকে তারই প্রতিচ্ছবি দেখি -

“মিষ্টি তুমি ভালোবাস/ তাই কি ঘরে পরে/ লোভী বলে তোমার নিন্দে করে।”^{১৫}

‘অপযশ’-এর পরিপূরক ‘বিচার’ কবিতাটি মায়ের ভাষ্যে বলা। এখানে মায়ের কণ্ঠে চিরন্তন সত্য কথাটির উচ্চারণ আছে- ‘শাসন করা তারই সাজে/ সোহাগ করে যে...’^{১৬}

প্রসঙ্গত বৈষ্ণব পদাবলীর আরও কিছু দৃষ্টান্তের উল্লেখ সম্ভব। মা যশোমতী গোপালকে চোখে হারান। বলরাম দাসের আরেকটি পদে সকল বালকদের খেলার মাঝে যাদুমণিকে না দেখতে পেয়ে যশোদা আকুল হয়েছেন -

“তোমরা করিছ খেলা গোপাল কোথায় গেলা/ দৃঢ় করি বল এক বোল।”^{১৭}

আমরা জানি, কৃষ্ণের বাল্যলীলা ও গোষ্ঠীলীলার পদে বলরাম দাসই শ্রেষ্ঠ। মায়ের কাছে সন্তান কোনদিনই বড়ো হয় না। প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের প্রতিও মা সেই স্নেহ ও বাৎসল্যের দাবি ছাড়তে পারেন না কখনো। গোপালের গোচারণে যাওয়া নিয়ে সেই কারণেই মায়ের আপত্তি। অতঃপর নানা শর্ত প্রয়োগ করে তবেই গোপালকে গোচারণে যাওয়ার সম্মতি দিয়েছেন

জননী। গোপাল তো চির রাখাল! কানাই-এর রাখালিয়ারূপে শুধু তার একার নয়। গোপপত্নীর সব বালকই রাখাল সেজে গরু বাছুর নিয়ে মাঠে যায়। এ তাদের খেলাও বটে! আর ভক্তের দৃষ্টিতে একে ‘লীলা’ বলা হয়। বলরাম দাস অন্য একটি পদে গোপাল, বলাই ও যশোদার ভূমিকাকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে উপস্থাপন করেছেন। বিষয়টি এই যে, কানাইকে কিছুতেই মা ধরাচূড়া পরাতে পারছেন না। পদকর্তা লিখেছেন –

“গোপালে সাজাইতে নন্দ রানী না পারিল।”^{২১}

তখন বলরাম এসে কানাইয়ের চূড়া বেঁধে দিল। পরিয়ে দিল অঙ্গদ বলয়। পীত ধরা পরিয়ে তাতে কোমরবন্ধ দিল। আর হাতে দিল বাঁশি। ললাটে ঐঁকে দিল অলকা তিলকা। চরণে নূপুর পরিয়ে দিল। এই বর্ণনায় মূলত সখ্য রসের প্রকাশ ঘটেছে। সেইসঙ্গে আছে বাৎসল্য রস। কিন্তু বলরামের হাতে গোপালের সাজ সম্পূর্ণ হলে যশোদা ছেলের মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকেছেন। তাঁর দৃষ্টি হয়েছে অশ্রুসজল। কারণ, এবার তাঁর আদরের যাদুধন সত্যিই গোচারণে চললেন। তাঁকে আটকানো যে অসম্ভব, এই ভাবনা যশোদাকে আরো কাতর করেছে। কানাইয়ের বাল্যকৌড়ার বর্ণনায় বলরাম দাস কিছু অভিনব সৃষ্টি করেছেন। কানাইয়ের তুলনায় বলাইয়ের গায়ে শক্তি বেশি। কখনো কখনো বাহুবলের খেলায় বলরাম জিতে যায়। ব্রজের বালকেরা কানাইকে ভালোবাসলেও বালকের বুদ্ধিতে তারা এমনও ভাবে যে, খেলায় কৃষ্ণের পক্ষে না থেকে তারা বলরামের পক্ষেই থাকবে। শিশুরা কখনোই অলৌকিক তত্ত্ব বা অবতারের তত্ত্ব দিয়ে সখাকে বিচার করতে পারে না। ‘ঈশ্বর’ বা ভগবান সম্বন্ধে তাদের বোধও ওই খেলা ও আনন্দেরই মতো। কানু বারবার খেলায় হেরে যাওয়ায় তার খেলার সাথীরা স্থির করেছে – ‘আর না খেলিব কানুর সঙ্গে।’^{২২} এই পদটিতে কানাই ও বলাইকে কেন্দ্র করে বাৎসল্যের দ্বিমুখী প্রকাশ ঘটেছে। আবার, বলরাম দাসের ‘যমুনার তীরে কানাই শ্রীদামেরে লৈয়া’ শীর্ষক পদে সখ্যরসের ভিন্ন প্রকাশ দেখি। খেলতে খেলতে প্রখর রবির তাপে গোপালের মুখ শুকিয়ে গেলে সখারা দুঃখ পেয়েছে। তারা নিজেরাই বলেছে – ‘আর না খেলিব ভাই চল যাই ঘরে’। তাছাড়া মা সকাল সকাল তাদের ঘরে ফিরতে বলেছেন–

“সকালে যাইতে মা কহিয়াছে সভারে।।/ মলিন হইল কানাই মুখানি তোমার।/ দেখিয়া বিদরে হিয়া
আমা সভাকার।।”^{২৩}

বোঝা যায়, কৃষ্ণ-সখারা শুধু কানাই-এর প্রতি অনুগত ও আন্তরিক নয়, যশোদাজননীর প্রতিও তারা দায়বদ্ধ। বাৎসল্য, প্রতিবাৎসল্য, নির্ভরতা ও সখ্যপ্রীতি – এসবই বলরাম দাসের পদে নব-ভাবনায় জারিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। ফলে গোপাল সহ অন্য শিশু চরিত্রগুলিও বিশেষত্বমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

যশোদার বাৎসল্যের বর্ণনাটিও কবি বলরাম দাসের লেখনিতে অনন্য হয়ে উঠেছে। পুত্রকে মাঠ থেকে ফিরতে দেখে মা ব্যাকুল হয়ে তাকে কোলে তুলে নিতে চেয়েছেন। রতন প্রদীপ নিয়ে ছুটে এসেছেন ছেলের কাছে। তখন সন্ধ্যা সমাগত। যশোদা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছেন গোপালের রাঙা চরণের দিকে। কারণ, মায়ের চিন্তা ছিল নব তৃণাকুর বিদ্ধ হয়ে গোপালের কোমল পা-এ যদি ব্যথা লাগে! পরম স্নেহে যত্নে কানাইয়ের হাত ও পা- দুটি মা নেতের আঁচলে মুছিয়ে দিয়েছেন। তারপর অজস্র চুম্বনে ভরিয়ে দিয়েছেন গোপালের মুখ। যেন উদ্বেগ মুক্ত হয়েছেন তিনি পুত্র গোচারণ থেকে গৃহে ফিরে আসায়। যশোমতীর স্নেহের ভাঙারের অপরিমেয় ঐশ্বর্য উক্ত পদে প্রকাশ পেয়েছে। অপূর্ব বর্ণনায় কবি কানাই-এর গোচারণস্থল থেকে ঘরে ফেরার সময়কালটি ফুটিয়ে তুলেছেন – ‘রতন প্রদীপ লইয়া আইলা নন্দরাণী।/ একদিঠে দেখে রাঙ্গা চরণ দুখানি।’ স্নেহের এই আন্তরিকতা, আপাতভাবে হয়তো আতিশয্য, কিন্তু সেখানেই এই স্নেহ বাৎসল্য তুলনামূলক রূপে প্রকাশ পেয়েছে। পদকর্তা বলরাম দাস যেন বলতে চেয়েছেন –

“তোমার নিছনি লৈয়া মরি যাউক মা।”^{২৪}

আশ্চর্য এই উচ্চারণ! যুগে যুগে মায়ের মন সন্তানের ভালো মন্দের সঙ্গে এভাবেই জড়িয়ে আছে। বাস্তব এই জীবনসত্য পদটিতে মূর্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের শিশু ভাবনায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে আমরা শুধু বৈষ্ণব পদাবলীকেই অবলম্বন করেছি। যদিও মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ সাহিত্যের শিশু চরিত্রের আলোচনা করলে কিছু নতুন অনুসন্ধান আলোকপাত করা যেত। বৈষ্ণব পদসাহিত্যে বাৎসল্য – প্রতিবাৎসল্যের চিত্রে পুত্র আর জননীর ভূমিকাই যেমন প্রাধান্য পেয়েছে,

রবীন্দ্রনাথের ‘শিশু’ ও ‘শিশু ভোলানাথ’ কাব্যদ্বয়েও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সময়ের ব্যবধানে মা ও সন্তানের সম্পর্কে যে কোন ফারাক হয় না, বৈষ্ণব কবিতার মা ও শিশু এবং রবীন্দ্রনাথের এই বিষয়কেন্দ্রিক কবিতাগুলি তার পরিচায়ক। কিন্তু এর বাইরেও রবীন্দ্র কবিতায় শিশুর স্বতন্ত্র উপস্থিতি নানা দিক থেকে বিশেষত্ব লাভ করেছে। একসময় যিনি ‘খোকা’ ছিলেন, পরিণত বয়সে সেই ‘খোকা’ দের কথা বলতে গিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা, শিশুর ভাবনার জগত ও মন-মনস্তত্ত্বের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। রবীন্দ্র কাব্যের শিশুরাও বালক রবীন্দ্রনাথের মতোই ভাবনা-চিন্তায় যথেষ্ট পরিণত। এই পরিণত মনের সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি প্রসঙ্গ ও পরিচয়ের উল্লেখ বর্তমান আলোচনার উপসংহারে পৌঁছবো। ‘ছড়ার ছবি’ (১৩৪৪)-র ‘কাঠের সিঁঙ্গি’ (১৩৪৪) কবিতায় ছোটদের খেলার জগতের ছবি আছে। তবে এই কবিতায় ছেলে ও মেয়েদের খেলার বস্তু যে আলাদা, সে কথাও স্পষ্ট - ‘মেজদিদি আর ছোড়দিদিদের খেলা পুতুল নিয়ে/ কথায় কথায় দিচ্ছে তাদের বিয়ে।’

সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় ‘সাহিত্যের পথে’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আমাদের খেলার মধ্যে জীবন যাত্রার নকল এসে পড়ে। যেমন, মেয়েদের পুতুল খেলা। মনে হয়, এ খেলা রবীন্দ্রনাথের পছন্দের ছিল না। ছেলেদের মধ্যে যে পুরুষসুলভ স্বতন্ত্র আচরণ থাকে, তারই জোরে ‘কাঠের সিঁঙ্গি’ কবিতার বালকটি বলেছে -

“কিন্তু তাদের খেলার পানে চাইনি কটাক্ষেতে।/ পুরুষ আমি, সিঁঙ্গিমামা নত পায়ের কাছে,/ এমন খেলার সাহস বল কজন মেয়ের আছে!”^{২৫}

ছড়ার শেষ পঙ্ক্তির ব্যাখ্যা প্রসারিত হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে সেই আলোচনায় না গিয়ে Vygotsky's ‘theory of play’-র কথা এখানে উল্লেখ করতে পারি। কারণ, ‘Vygotskian View’ on Gender-Based Play’ এক্ষেত্রে বিষয়টির মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় আমাদের সহায়ক। আপাতত আমরা সেই কাঠের সিঁঙ্গিতেই ফিরব। ‘ছেলেবেলা’ (১৯৪০) গ্রন্থে তাঁর খেলার সাথী এক কাঠের সিঁঙ্গির কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন -

“...তার পিঠে কাঠি দিয়ে অনেক কোপ দিয়েছি। মন্তুর বানাতে হয়েছিল, কিন্তু নইলে পুজো হয় না। -
‘সিঁঙ্গিমামা কাটুম/ আন্দিবোসের বাটুম/ উলকুট ঢুলকুট ঢামকুড়কুড়/ আখরোট বাখরোট খট খট খটাস/
পটপট পটাস।”^{২৬}

চল্লীমঙ্গলের কালকেতু শিশুকাল থেকেই পশুদের সঙ্গে লড়াই করার দক্ষতা অর্জন করেছে। আবার বৈষ্ণব পদাবলীর যশোদা বড় গরু যাতে গোপালের কোনো ক্ষতি করতে না পারে, সেই সতর্কতার কথা কৃষ্ণ ও তার সখাদের কাছে বলেছেন - ‘কারো বোলে বড়ো ধেনু ফিরাইতে না যাইও কানু।’ আর রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর কবিতার বালক চরিত্রটি কাঠের সিঁঙ্গি নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। মোটকথা একটা বীরত্বভাব ও নতুন কিছু করে দেখানোর বাসনা সব শিশুর মধ্যেই থাকে। যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন - ‘খুব একটা কান্ড বাঁধানোর ইচ্ছা’, এ চিরকালীন শিশুর বৈশিষ্ট্য। অনন্ত এখানে সান্তে এসে মেলে। আবার নতুন খেলা শুরু হয়। আবহমান কাল ধরে সেই খেলাঘর নতুন ভাবনার ইঙ্গিতবাহী হয়ে ওঠে।

Reference:

১. রায়, সুশীল, ‘শিক্ষা মনোবিদ্যা’, ‘জীবন বিকাশের স্তর’, কলকাতা, সোমা বুক এজেন্সি, নতুন সংস্করণ, ২০১০-১১, পৃ. ১৮২
২. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (সম্পা.), ‘বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র’, ত্রয়োদশ সংস্করণ, মাঘ ১৪১৭, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, পৃ. ২০১
৩. তদেব, পৃ. ২০২
৪. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন ও রানা, সুমঙ্গল (সম্পা.), ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’, কলকাতা, রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯০, পৃ. ১৭৭
৫. ‘খেলা’, ‘শিশু’ কাব্যগ্রন্থ, বিশ্বভারতী, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩, পৃ. ৮
৬. মিত্র, খগেন্দ্রনাথ, সেন, সুকুমার, চৌধুরী, বিশ্বপতি, চক্রবর্তী শ্যামাপদ (সম্পা.), ‘বৈষ্ণব পদাবলী চয়ন’, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনর্মুদ্রণ ২০১৭, পৃ. ১৫

৭. তদেব, পৃ. ১৬
৮. তদেব, পৃ. ১৭
৯. সেন, সুকুমার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪০১, পৃ. ১০৩
১০. মিত্র, খগেন্দ্রনাথ, সেন, সুকুমার, চৌধুরী, বিশ্বপতি, চন্দ্রবর্তী শ্যামাপদ(সম্পা.) 'বৈষ্ণব পদাবলী চয়ন', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনর্মুদ্রণ ২০১৭, পৃ. ১৭
১১. তদেব, পৃ. ১৬
১২. 'বীরপুরুষ', 'শিশু' কাব্যগ্রন্থ, বিশ্বভারতী, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩, পৃ. ২৮
১৩. 'ছোটোবড়', 'শিশু' কাব্যগ্রন্থ, বিশ্বভারতী, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩, পৃ. ২৬
১৪. মিত্র, খগেন্দ্রনাথ, সেন, সুকুমার, চৌধুরী, বিশ্বপতি, চন্দ্রবর্তী শ্যামাপদ(সম্পা.) 'বৈষ্ণব পদাবলী চয়ন', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনর্মুদ্রণ ২০১৭, পৃ. ২১
১৫. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা.) 'বৈষ্ণব পদাবলী', কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, সংশোধিত সংস্করণ, মাঘ ১৩৮৬, পৃ. ১০৯৫
১৬. 'খেলা', 'শিশু' কাব্যগ্রন্থ, বিশ্বভারতী, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩, পৃ. ৮
১৭. 'অপযশ', 'শিশু' কাব্যগ্রন্থ, বিশ্বভারতী, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩, পৃ. ১৩
১৮. তদেব
১৯. 'বিচার', 'শিশু' কাব্যগ্রন্থ, বিশ্বভারতী, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩, পৃ. ১৪
২০. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা.) 'বৈষ্ণব পদাবলী', কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, সংশোধিত সংস্করণ, মাঘ ১৩৮৬, পৃ. ৭৪২
২১. তদেব, পৃ. ৭৪৩
২২. তদেব, পৃ. ৭৪৪
২৩. তদেব
২৪. তদেব, পৃ. ৭৪৫
২৫. 'কাঠের সিঁজি', 'ছড়ার ছবি' কাব্যগ্রন্থ, বিশ্বভারতী, রবীন্দ্র রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, মাঘ ১৪২১, পৃ. ৭১
২৬. 'ছেলেবেলা', বিশ্বভারতী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, চৈত্র ১৪২২, পৃ. ৭১৪